Vol. 54 | No. 2 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শব্দের বহুস্বর : অগ্নি-বীণা কাব্যের যৌগিকীকরণ প্রসঙ্গ

Volume	54
Issue	2
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সানজীদা মাসুদ
Published online	February 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i2.9
Pages	১৮১-২০০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শব্দের বহুস্বর : *অগ্নি-বীণা* কাব্যের যৌগিকীকরণ প্রসঙ্গ

সানজীদা মাসুদ*

সারসংক্ষেপ : কাজী নজরুল ইসলামের *অগ্নি-বীণা* (১৯২২) কাব্যটি বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আত্মপ্রকাশের একটি বিশেষ ভঙ্গিমা নিয়েই কবি এ কাব্যে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ধারণ করেন সংহারব্রত। তাঁর সেই বিশেষ ভঙ্গিমার অংশ হিসেবে বর্তমান প্রবন্ধে বিবেচিত হয়েছে শব্দের যৌগিকীকরণ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠনে নজরুল দেশি-বিদেশি-আরবি-ফারসি-সংস্কৃত-ইংরেজিসহ আরও নানান শব্দ-উৎসের দ্বারস্থ হন। অর্থাৎ তাঁর যাপিত জীবনের অসাম্প্রদায়িকতার বোধকে তিনি সচেতনভাবে সঞ্চারিত করেন এ-কাব্যের শব্দরীতিতে। ভিন্ন বিন্যাসে বিন্যস্ত এসব শব্দ আর একটি অর্থ-কাঠামোতে সুস্থির থাকেনি; তা একই সঙ্গে সমকালের ও মহাকালের চাহিদা মিটিয়েছে। যে- সময়ের সৃষ্টি এসব শব্দ, সে-কাল অতিক্রান্ত। কিন্তু শব্দগুলোর আবেদন আজও অনিঃশেষ। ভবিষ্যতেও এর প্রাসঙ্গিকতা বাড়বে বৈ কমবে না। তাঁর শব্দেরা মহাকালিক বিশালতার মধ্যে বিচরণ করে প্রতিনিয়ত সৃজন করে চলেছে নতুন সুর ও স্বর, নানা অর্থবৈচিত্র্য। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়টিই অনুসন্ধানের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

ভূমিকা

সচেতন, সুশৃঙ্খল ও শৈল্পিক শব্দবিন্যাসের মধ্য দিয়ে জন্ম হয় কবিতার। মহৎ কবির হাতে সেই বিন্যাস-প্রক্রিয়া ব্যতিক্রমী, ব্যঞ্জনাঋদ্ধ ও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে; কালের পটে স্বয়ং কবিও হন অমর। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তেমনই এক সচেতন শব্দ-সৈনিক। তাঁর শব্দচেতনা সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য –'ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর'। সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে অদম্য প্রাণশক্তি ও বিপুল উদ্দীপনায় অচিরেই নজরুল তৈরি করে নেন স্বোপার্জিত শব্দচয়ন রীতির ভুবন। নজরুলের অধিকাংশ লেখায়, বিশেষত কবিতায় ব্যবহৃত শব্দমালা একটি অর্থে স্থির থাকেনি; বরং নির্বাচন-গুণ ও প্রয়োগ-পরিকল্পনায় ও একাধিক

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থের মর্যাদা পেয়েছে। দ্রোহ, প্রেম ও সৌন্দর্যের ধারণাসহ নজরুল-চেতনবিশ্বের সমস্ত প্রান্তই বিশ্লেষিত হতে পারে এই স্বোপার্জিত শব্দশিল্পের ওপর ভর করে। শব্দের যৌগিকীকরণের স্বচ্ছন্দ ও পৌনঃপুনিক প্রয়োগ নজরুল-মানসের অনায়াসলব্ধ একটি প্রান্ত। এই প্রবণতা *অগ্নি-বীণা* (১৯২২) কাব্যগ্রন্থে নব-সৌন্দর্যবীক্ষণ হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। শব্দব্যবহারের এমন নতুন নিরীক্ষা বাংলা কবিতার ইতিহাসে চমকিত, সদর্থক এবং কালোত্তীর্ণ; যা ব্যাপক পর্যালোচনা ও গবেষণার দাবি রাখে। শব্দের যৌগিকীকরণ প্রয়োগ-সাফল্যে কীভাবে বহুমাত্রিক অর্থ ধারণ করে, বর্তমান লেখায় *অগ্নি-বীণা* কাব্য বিশ্লেষণ-সূত্রে নির্ণীত হবে।

দুই

নজরুলের সাহিত্যভাষা : স্বোপার্জন ও উত্তরাধিকার

নজরুলের পূর্বসূরি এবং সমসাময়িকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তসহ অনেকেই বাংলা কাব্যশৃঙ্খলার প্রচল প্রথা ডিঙিয়ে নূতন ধারার সৃজনে সচেষ্ট ছিলেন। *দুর্গেশনন্দিনী*-র দশম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাগত পরীক্ষা লক্ষ্যযোগ্য : 'বিমলা কেশ বিন্যস্ত করিয়া কবরী বন্ধন করিলেন না; পৃষ্ঠদেশ বেণী লম্বিত করিলেন। গন্ধবারিসিক্ত রুমালে মুখ পরিষ্কার করিলেন; গোলাপপূগকর্পূরপূর্ণ তাম্বুলে পুনর্ব্বার ওষ্ঠাধর রঞ্জন করিলেন; মুক্তাশোভিত কাঁচলি লইয়া বক্ষে দিলেন; সর্বাঙ্গে কনকরত্নভূষা পরিধান করিলেন; আবার কি ভাবিয়া তাহার কিয়দংশ; পরিত্যাগ করিলেন; বিচিত্র কারুকার্যখচিত বসন পরিলেন; মুক্তা-শোভিত পাদুকা গ্রহণ করিলেন; এবং সুবিন্যস্ত চিকুরে যুবরাজদত্ত বহুমূল্য মুক্তাহারে রোপিত করিলেন।' (বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০১ : ১৩) বাংলা সাহিত্যের এক প্রবল প্রভাববিস্তারকারী প্রতিভা হিসেবে রবীন্দ্রনাথও এক স্বতন্ত্র ভাষারীতি নিয়ে আবির্ভূত হন। তাঁর 'বোষ্টমী' গল্প থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ : 'পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৩ : ৪৯৮) ভাষারীতিতে রবীন্দ্র-পথ গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়েই নজরুল নিজের ধারা তৈরি করে নেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ মনকে হয়তো কিছুটা বন্ধনের মধ্যে রেখেই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নজরুলের তরুণ-প্রাণ বন্ধনহীন। সে-মন উন্মুক্ত বলাকার মতো বিচরণ করেছে সাহিত্যের আকাশে। একইভাবে নজরুলের সমকালীন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত *কুহু ও কেকা* কাব্যের "অবগুণ্ঠিতা" কবিতায় বলেন : 'আমি বসনে ঢেকেছি মুখ/ দেখিতে তোমায়/ দূরে স'রে যাই, / বুকে আঁকিতে তোমায়! / তুমি অভিমান-ভরে ফিরে যেয়োনা,/ নিরাশ নয়নে বঁধু তুমি চেয়ো না; (সত্যেন্দ্রনাথ, ২০১০)।

মোহিতলাল মজুমদার "পান্থ" কবিতায় জানিয়েছেন : 'সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি মিথ্যা সনাতনী/ সত্যেরে চাহি না তবু সুন্দরের করি আরাধনা।' যতীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রমুখ সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে সঞ্চার করেন প্রাণের স্পন্দন। নজরুল তাঁর পূর্বসূরিদের নিকট থেকে প্রাণের স্পন্দন তথা ভাবগত দিকটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকাশভঙ্গিটি ছিল স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে, কবিরা একই ধারায় লেখেন না কিংবা বলা যায় একই রূপ-রীতি অবলম্বন করেন না। কবি-মানসের স্বতন্ত্র গঠন-বিন্যাস ও ভিন্ন জীবনাভিজ্ঞতার কারণেই প্রকাশের রূপটি ভিন্ন হয়ে ওঠে। নজরুল বাঁধনহারা। তিনি দমিয়ে রাখেননি তরুণ প্রাণ-চঞ্চল মনটিকে। এমনকি স্বীকার করেননি কোনোরূপ কৃত্রিমতা। প্রাণের মর্মমূলে উৎসারিত ভাবনাগুলো নজরুল তাই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেলে ধরতে পেরেছেন। আর তাই বলা যায় তাঁর অধিকাংশ লেখা স্বতঃস্ফূর্ত মনের শিল্পিত প্রকাশ। শিল্পীমনের স্বতঃস্ফূর্ততাই তাঁর লেখায় নিয়ে এসেছে ভিন্নতা। এবং এরই বলে নজরুল ঐতিহ্য, প্রভাব ও অনুরাগ সমস্ত কিছু কাটিয়ে উঠে অনন্য ভূমিকায় উপনীত হতে পেরেছিলেন। এই অনন্যতার অন্যতম নির্দশন তাঁর ভাষাগত অভিনতুন চিন্তা। কবিতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপাভিব্যক্তি থেকে মুক্ত করে তিনি এমন এক উদ্দামতার মধ্যেহিল্লোলিত করলেন – যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন ও যুগাতিক্রমী। নজরুল ভাষায় যোগান দিলেন তেজ ও তাপ, ছন্দ ও গতিতাঁর হাতেই নির্মিত হয় বাংলা ভাষার সম্ভাবনার নতুন দিগ্বলয়, ভাষার নবদৃষ্টিভঙ্গি। বিপ্লবী মানসতা, প্রতিবাদের নেশা, রোম্যান্টিকতা-প্রসূত প্রেমবোধের সুতীব্র উচ্ছ্বাস, সৌন্দর্যের ধারণা : নজরুল-চিত্তের এসব ভাবকল্পের অনুগামী-সূত্রেই তাঁর শব্দযাত্রা হয়েছে তীব্রগতিমুখী, বেগময়, শানিত, উচ্চনাদী, ঝকঝকে, আবেগী এবং প্রাণ-প্রবাহী। অভিজ্ঞতা ও আবেগের মিশেলে স্বচ্ছন্দভাবে, অপ্রতিরোধ্য গতিতে, দ্বিধাহীনচিত্তে শব্দ বুনে চলার সামর্থ্যের পরিচয় নজরুল-পাঠক পেতে শুরু করেছেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই। তাঁর স্বতন্ত্র শব্দযাত্রার আরম্ভবিন্দু *অগ্নি-বীণা* হলেও এর দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে সমগ্র নজরুল সাহিত্যে। মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার পূর্বে প্রবন্ধসাহিত্যে নিজস্ব শব্দরীতিতে নজরুলের স্বচ্ছন্দ বিহার একটু দেখে নেওয়া যাক : 'নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয়-সাইক্লোনের আর্তনাদ মরণ-বিভীষিকার রক্ত-সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মা'কে আমার উলঙ্গ ক'রে টেনে নিয়ে চ'লেছে আর চাবকাচ্ছে যে সে দানবও নয়, দেবতাও নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চ'লেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী। তারা যতবার আলো জ্বালাতে চায়, ততবারই নিভে নিভে যায়।... শুধু ক্রন্দন, শুধু হা-হুতাশ – শক্তি নাই, সাহস নাই।' (নূরুল ও রশিদুন, ২০১১ : ১০১) উপন্যাসশিল্পেও অক্ষুণ্ন থেকেছে তাঁর ভাষাগত নান্দনিকতা – 'আনসার দেখতে পেল, ইঞ্জিনের অগ্নিচক্ষুর মতই অদূরে দুটি চক্ষু জ্বলছে। মৃত্যু-ক্ষুধার মত সে চাউনি জ্বালাময়,

বুভুক্ষু, লেলিহান। সে চোখে অশ্রু নাই, শুধু রক্ত।' (ইন্সটিটিউট, ২০১২, পরি: একুশ) নজরুল মূলত জীবনাভিজ্ঞতা ও স্বীয় দর্শনের আলোকে গড়ে নেন বিশিষ্ট শব্দশৈলী। এমনকি স্পষ্ট, সরাসরি বলার কথাও তাঁর হাতে ভিন্ন আবহে বিন্যস্ত করে চলেন অনায়াসেই। তাৎক্ষণিক জুতসই কথা বলার ও নেতৃত্বমূলক শব্দ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি নজরুল। *সর্বহারা* কাব্যের 'ধীবরের গান' কবিতায় –'আমরা নিচে প'ড়ে রইব না আর/ শোন রে ও ভাই জেলে,/ এবার উঠব রে সব ঠেলে!/ ঐ বিশ্ব-সভায় উঠল সবাই রে,' (নূরুল, ২০১০) সরাসরি উত্তরাধিকার থেকে শব্দ নিয়ে কাজ করা নজরুলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ নজরুলের শব্দগুলো বলিষ্ঠ সমাজ-রাজনীতিসচেতন বক্তব্যের অনুগামী হয়েই নির্বাচিত হয়েছে। স্বোপার্জিত শব্দশৈলীর জগৎ গড়ে তুলে নজরুল একদিকে সমগ্রের সন্ধান করেন, অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের একটি অকর্ষিত ভূমিকে সুফলা করে তোলেন। আর এখানেই নজরুলের বিশেষত্ব। কাজী আবদুল ওদুদ যথার্থই বলেছিলেন : There is a great surge of life within this poet which bears away all his faults, however numerous. Moreover, he is the only writer of modern Bengal who has specially succeeded in touching the mass mind. The poetry of Nazrul has been one of the contributing factors of that awakening of the masses that we now see about us. From that point of view his historical importance is very great indeed. (আবদুল, ২০০১ : ১৪৩)

তিন

যৌগিকীকরণ

বাংলা ভাষার ব্যাকরণে শব্দ গঠনের নানা প্রক্রিয়ার উল্লেখ রয়েছে। যৌগিকীকরণ (compounding) সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। শব্দগঠনের বিশিষ্ট ও উন্নত একটি পদ্ধতি যৌগিকীকরণ। এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে 'a innovative way forgenerating new words'. দুই বা তার বেশি শব্দের একত্রীকরণই যৌগিকীকরণ হিসেবে অভিহিত। 'a compound is awordwhich consists of two or more words'. (Fabb, Nigel, page : 66: 1998) বাংলাসহ জার্মান, সংস্কৃত, হিন্দি, চিনা প্রভৃতি ভাষায় যৌগিকীকরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষণীয়। বাংলা যৌগিক-প্রক্রিয়ার রয়েছে একটি দীর্ঘ ও ঋদ্ধ ইতিহাস। চর্যাপদ থেকেই এর যাত্রারম্ভ হলেও বাংলা ভাষার পণ্ডিতমহল ও সাহিত্যিকদের হাতে এর ক্রমবিকাশ। নজরুল-পূর্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের লেখনীতে যৌগিকীকরণের নানা মাত্রা লক্ষণীয়। তবে নজরুল-সাহিত্যে যৌগিক শব্দ ব্যবহারের অজস্রতা ও কুশলতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। 'তাঁর যৌগিক শব্দ প্রয়োগের অজস্রতা দেখে ডিলান টমাস- এর অনুরূপ কুশলতার কথা মনে পড়ে

যায়।' (আবদুল, ১৯৮৭ : ২৩)। *অগ্নি-বীণা*-র ভাষা-শক্তির একটি বড় দিক যৌগিকীকরণ। এ কাব্যে যৌগিকীকরণের দুটি দিক আমাদের বিবেচ্য :

ক. একাধিক ভাষার যৌগিক শব্দ

খ. সমাসবদ্ধ যৌগিক শব্দ

চার

তত্ত্বীয় কাঠামো

একস্বরিক ধারণার বিপরীত প্রক্রিয়া হিসেবে শিল্পসাহিত্যে বহুস্বরিক তত্ত্বের (polyphony) সূত্রপাত ঘটে মিখাইল মিখাইলভিচ বাখতিনের (১৮৯৫-১৯৭৫) চিন্তাসূত্রে। তিনি ১৯২৯ সালের দিকে দস্তয়েভস্কির শিল্প-সংক্রান্ত গ্রন্থে উপন্যাসকে উপলক্ষ্য করে পলিফনি সম্বন্ধে প্রথম ধারণা দেন। 'Dostoyevsky`s novels are said to be polyphonic in that there is no central 'voice' and in that their characters are characterized not by their temperament or their psychological make-up but by their ideas and the way they expound and discuss them. (Macey, 2000 : 28) তাঁর মতে উপন্যাস কখনোই একস্বরিক হতে পারে না, তা সর্বদাই বহুস্বরিক তথা বহু অর্থজ্ঞাপক। এটি অথরের কর্তৃত্ব ভেঙে দেয়। ফলে পাঠকের এক ধরনের স্বাধীনতা থেকে যায়। পাঠক তার পঠন-পাঠন ও অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি করে নেন ভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। অর্থাৎ পাঠক মুখোমুখি হন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের নানাবিধ ডিসকোর্স বা বয়ানের। বাখতিন এ ধারণাটি সাহিত্যে এনেছেন সংগীতজগৎ থেকে। সংগীতের ভুবনে পলিফনি অর্জিত হয় অর্কেস্ট্রেশনের (বহু বাদ্যযন্ত্রের সংযোগে সৃষ্ট সিম্ফনি) মধ্য দিয়ে, যাকে বলা যায় 'many voices in music, nonedominates'। অন্যদিকে, 'polyphony literally means multi-voicedness' অর্থাৎ, একাধিক অর্থ তৈরির সম্ভাবনা ও সামর্থ্যকে পলিফনি হিসেবে গণ্য করা হয়। পলিফনিক দৃষ্টিতে একটি টেকস্টের বহু ব্যাখ্যা হতে পারে, তৈরি করতে পারে নানা অর্থ-সম্ভাবনা; এবং শেষ পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারে সাহিত্যের ভিন্ন ডাইমেনশন তথা বহুস্বরিক বোধ। সুতরাং পলিফনি হলো অর্থের বহুমাত্রিক ও নান্দনিক প্রকাশ।

সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায় স্বরভঙ্গির আড়ালে থাকে মনোভঙ্গি। কবিতায় স্বরভঙ্গি ও মনোভঙ্গির বিন্যাস বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। কবি কণ্ঠস্বরকে আড়ালে রেখেই কথার বিন্যাস গড়ে তোলেন। এই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষের মেলবন্ধনেই কবিতার একটি রূপাবয়ব গড়ে ওঠে – যা থেকে এক বহুস্তরায়িত ঐক্যের দিকে ক্রমশ এগোতে থাকেন পাঠক। কখনোবা আপাত প্রত্যক্ষতার আড়ালে না-বলা কথাকে ধারণ করা হয়– তাদেরই সমবায়ে গড়ে ওঠে কবিতার পলিফনি বা

বহুস্বর। অর্থাৎ বলা আর না-বলার বিন্যাস প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও তৈরি হতে পারে বহুস্বরিক চেতনার, যা পাঠককে সমগ্রের সন্ধানে উৎসাহী করে তোলে।

মূলতশব্দে শব্দে কবিতার জন্ম, শব্দেই পরিস্ফুট হয় কবির কল্পনা ও অনুভবচেতনার নানা প্রান্ত। কখনোবা কবির মানসপ্রতিভার উজ্জ্বলতায় শব্দ যাত্রা করে অসীমের পানে। একটি শব্দই কখনো কখনো হয়ে উঠতে পারে কবির মৌল চেতনার সংকেত বাহক। আর সেই শব্দটি তখন প্রচলিত অর্থের গণ্ডি অতিক্রম করে অন্য অর্থ তৈরির সামর্থ্য রাখে। বাখতিনের ভাষায় শব্দটি তখন বহুস্বরিক হয়ে ওঠে। নজরুলের *অগ্নি-বীণা* কাব্যে শব্দের যৌগিকীকরণের অজস্র উপস্থিতি কীভাবে পলিফনিক চেতনা নির্মিতিতে শিল্পসফল হয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে বিশ্লেষণী-বীক্ষায় সেটি বিবেচিত হবে।

পাঁচ

একাধিক ভাষার শব্দ : যৌগিকীকরণ ও বহুস্বরিকবোধ

নজরুলের সাহিত্যজীবন ও যাপিতজীবনের দ্রোহচেতনা সম্পর্কে একথা অবিসংবাদিত : তিনি শোষণের পক্ষে কখনোই অবাঙ্‌মুখ নন; বরং প্রবলভাবে আপসহীন, দ্বিধাহীন। তাঁর লেখার রসদ শোষিতের পক্ষে, শোষণের বিপক্ষে। *অগ্নি-বীণা*-য় তাই ঝংকৃত হলো বিপ্লবস্পন্দিত অগ্নিযুগের জ্বলন্ত স্মৃতিকথা ও চিত্রময়তা। এ কাব্যের প্রতিটি বাক্য, শব্দ, অক্ষর, ধ্বনি সবই শোষণের বিরুদ্ধে নজরুলের এক একটি ধারালো অস্ত্র। বহুপ্রত্যাশিত এক নবযুগের প্রসববেদনায় কাতর যে কবি, চিরবঞ্চিতের প্রাণপ্রতিষ্ঠার বাণী কণ্ঠে নিয়ে যিনি হলেন আধুনিক শিব; কাব্যের রং-রূপ-রস, ভাষার সৌষ্ঠব প্রভৃতি নিয়ে ভাববার অবকাশ সেই কবির নিকট গৌণ বলে প্রতিভাত হবার সুযোগ ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো নজরুলের ক্ষেত্রে সেটি ঘটেনি। নজরুল সমসাময়িক কালস্রোত থেকে শব্দ বাছাই করে সমর্পণ করেন আগামীর গর্ভে। এখানে 'কালবেলায় রুদ্রপাঠ'– প্রবন্ধের সূচনাংশটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত : আবদুল কাদির সম্পাদিত *নজরুল রচনাবলী*–র প্রথম খণ্ডে "গ্রন্থপরিচয়" অংশে *রুদ্রমঙ্গল* গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, এতে 'প্রকাশকালের উল্লেখ নাই'।... এই তথ্যঘাটতির একটি প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। প্রকাশকাল না থাকার বিষয়টি প্রকারান্তরে আমাদের যেন জানাতে চায় যে, এই গ্রন্থটি কোনো এক বিশেষ কালের নয় বরং কালান্তরে পৌনঃপুনিকভাবে এই গ্রন্থ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে সক্ষম; নজরুল যেন জানতেন, যুগে যুগে অনাহূত অথচ অমোঘ কালবেলায় রুদ্রের আবাহনগাথা অনিবার্য হয়ে ওঠে। (সনজীদা, ২০১৩ : ২১৫) সমালোচকের এ বক্তব্য নজরুলের শব্দরীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। আর তাই তাঁর প্রয়োগকৃত শব্দসমূহ তাৎক্ষণিক সময়জাত হলেও আজও তাতে আমরা খুঁজে পাই নতুন জীবনবেদ, নতুন সুর ও স্বর, গন্ধ ও স্বাদ। সুতরাং বলা যায় তাঁর শব্দরীতি সময়ের পটে নানা অর্থ-মাত্রা লাভ করে। যেমন :

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল!...
বিশ্বমাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল দোলে!
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর–
[প্রলয়োল্লাস]

নজরুল যেন জানতেন 'মানবজাতিকে সমাজে একতাবদ্ধ করবার ক্ষেত্রে এবং তাদের মধ্যে নৈতিক জীবন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নৃত্যের প্রভাব সবিশেষ কার্যকর হয়েছে।... মানবের ... শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলিই নৃত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৃত্যই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে শিখিয়েছে। (সৈকত, ১৯৯৪ : ১২৮) তাঁর শিব তাই 'প্রলয়- নেশার নৃত্য-পাগল'; যেনবা নজরুল ভিন্ন এক সভ্যতার রূপকল্প গড়তে উৎসাহী। এখানে 'প্রলয়-নেশা' ও 'বক্ষ-কোলে', 'হট্টগোল' যৌগিক শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত।'প্রলয়' সংস্কৃত, 'নেশা' ফারসি শব্দ (নেশা শব্দটি ফারসি 'নিশাহ' থেকে এসেছে)। 'নেশা' শব্দটি প্রচলিত অর্থ-সামর্থ্য নিয়ে নজরুলের নিকট ধরা দেয়নি। 'প্রলয়-নেশা' শব্দবন্ধে মাদকসেবনের মত্ততা কিংবা বিহ্বলতা নয়; বরং প্রলয়ের প্রতি নজরুলের প্রবল ঝোঁক, আসক্তি ও প্রীতিভাব প্রকটিত। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নজরুল একজন যুদ্ধফেরত সৈনিক। যুদ্ধের ময়দানে তিনি যে গতিবেগ, যে শক্তি, সর্বোপরি যে মোহময়তা অনুভব করেন; শেষপর্যন্ত তা-ই তাঁর কবিতার শরীর গড়ে তুলছে অবলীলায়। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুনের আবাহনগীতি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছিলেন, কবিতায় সেই চেতনাকে ধারণ করতেই কবিমন সুদৃঢ় ও প্রত্যয়ী। ধ্বংসের উন্মাদনায় পৃথিবীর বুকে কবি তাই পুরাণের ধূসরতা থেকে ফিরিয়ে আনেন ধ্বংসকামী প্রবণতায় উন্মত্ত অথচ সৃষ্টির চেতনায় উদ্ভাসিত দেবতাকে। আর তার আগমনে মুখরিত ধরাধামের শব্দচিত্র হিসেবে ব্যবহার করেন 'হট্টগোল' শব্দটি। সংস্কৃত 'হট্ট', ফারসি 'গোল' শব্দের যৌগিকীকরণে সৃষ্ট 'হট্টগোল'। উদ্ধৃতির 'বক্ষ-কোলে'– এর উৎসস্থল যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষান্তর। প্রত্যাশিত বিদ্রোহী সত্তার আবির্ভাব-বার্তা বিশ্বের সমস্তপ্রান্তে পৌঁছে দিতেই মূলত কবি দ্বারস্থ হন ফারসি-সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দ ও শব্দাংশের। তাঁর শব্দেরা আর সুস্থির থাকে না; এক মহাজাগতিক বিশালতার মধ্যে সেগুলোর বিচরণ। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা সর্বত্রই কবি বিচরণ করেন; খুঁজে ফেরেন প্রত্যাশিত দ্রোহী সত্তাকে। কখনোবা কবি যেন শুনতে পান তার আগমনের রণধ্বনি :

ঢাল-তলোয়ারে খনখন!
একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন
[আগমনী]

রণ রঙ্গে ঢাল-তলোয়ারের ঝনঝন, খনখন আওয়াজে ভারতীয় ঐতিহ্যের অংশ দেবী দুর্গার আবির্ভাব। তার আগমন-ধ্বনি তাই কি কবি জানান দিচ্ছেন আমাদেরই চিন-পরিচিত ভাষা-কাঠামোয়? তাই কি তিনি ব্যবহার করেন যথাক্রমে খাঁটি বাংলা ('ঢাল') ও সংস্কৃত ভাষাজাত ('তলোয়ার') শব্দে? হয়তো তা-ই। কবির আঁকা দেবী দুর্গার এই প্রচণ্ডরূপের মধ্যে সমকালীন বিপন্নতা অতিক্রমণের আকাঙ্ক্ষা সুচিত্রিত। কিন্তু বহুরূপের সাধক-কবি দেবীর এক রূপে আটকে থাকতে নারাজ। তাই পরক্ষণেই সন্ধান চলে অন্যরূপের, অন্যস্বরের–

দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
[রক্তাম্বরধারিণী মা]

নারীর শক্তি-সামর্থ্য ও কঠোর-কোমলের মিশেলে যে সংগ্রামদীপ্ত, স্বতন্ত্র ও মঙ্গলময় মাতৃমূর্তি; কবি সেই রূপ আমাদের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে একান্তভাবে দ্রবীভূত করতে বেছে নেন সাধারণ পাঠকের চেনাজানা জগতের শব্দই। কবির আশ্রয় 'কল্যাণ' [সংস্কৃত] - 'করই' [বাংলা] শব্দপ্রতীক। দানবীয় শক্তিকে নিঃশেষিত করে দেবীর কোমল মূর্তিতে প্রত্যাবর্তনের রূপাবয়ব নির্মিতিতে নজরুল ভারতীয় ভাষাকাঠামোতে সাবলীল। এতেও পরিতৃপ্ত নন কবি, আবারও ছুটে চলেন: তন্নতন্ন করে খোঁজেন প্রকাশের নতুন স্বর ও সুর–

তোর জান্ যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়!
ধরে ঝঞ্ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুসলিম-পঞ্জায়!
[রণ-ভেরী]

মুসলিম পরিবারে জন্ম, ব্যক্তিজীবনের উষালগ্নে আরবি-ফারসি ভাষায় হাতেখড়ি, স্কুলশিক্ষকের উৎসাহে, করাচির সেনানিবাসে মৌলভীর সান্নিধ্যে হাফিজ ও রুমির কাব্যানুধ্যানের মাধ্যমে নজরুল আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি প্রবল অনুরাগী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাই বলে এসব শব্দপ্রয়োগে তিনি জবরদস্তি করেন না, প্রাধান্য দেন শিল্পমানের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজন বুঝে। এখানে 'মুসলিম' [আরবি] ও 'পঞ্জায়' [ফারসি 'পঞ্জ' থেকে] শব্দগুচ্ছে মুসলিম সমাজের আত্মবিশ্বাস ও বাহুবলের চিহ্নায়ন বিশেষ সহায়ক–যা অস্বীকারের উপায় নেই। গ্রিসের বিপক্ষে অঙ্গোরা-তুর্ক সরকার যে যুদ্ধ চালিয়েছিল, সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে কামাল পাশার সাহায্যের জন্যে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগের খবর পেয়ে এ কবিতাটি লেখেন বলে কবি জানিয়েছেন। ইতিহাস-পরিক্রমায় বাঙালি মুসলমানের আত্ম-অহংকার ও আত্মবিশ্বাসের ইঙ্গিতময় উচ্চারণ হিসেবেও এ অংশটি বিবেচিত হতে পারে। ইতিহাসের তরঙ্গায়িত জীবনস্রোত থেকে নজরুলের বেছে নেয়া শব্দরাজি এভাবেই কালের ও মহাকালের দাবি পূরণ করেছে একই সঙ্গে –

দুশমন-লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্-মিল্,
[শাত-ইল-আরব]

ফারসি ও সংস্কৃত শব্দের সমন্বয়ে 'দুশমন-লোহু' যৌগিক শব্দটির সৃষ্টি। আরবের ঐতিহ্যমণ্ডিত শাত্-ইল্ আরব নদী বীরের রক্তে উল্লসিত, ঈর্ষায় নীলাভ শত্রুর শোনিতে। শত্রুর রক্তকে শাত-ইল-আরব নদীর তরঙ্গের ঝিলমিল চিত্রে দেখেন কবি। রক্তে যাঁর দ্রোহের অগ্নিস্রোত, তাঁর পক্ষেই রক্তের এমন রূপ কল্পনা করা সম্ভব। যৌগিকীকরণের প্রতি কবির প্রবল আগ্রহের প্রমাণ মেলে একই কবিতার অন্যান্য স্তবকেও –

ললাটে তোমার ভাস্বর টিকা
বস্‌রা-গুলের বহ্নিতে লিখা;
এ যে বসোরার খুন-খারাবি গো রক্ত-গোলাপ-মঞ্জরীর
খঞ্জরীর
[শাত-ইল-আরব]

উদ্ধৃতির তিনটি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দে শব্দে চমৎকার যৌগিকীকরণ ঘটেছে। এক. 'বসরা-গুল'–এর 'বসরা' আরবি বসরাহ্ এবং 'গুল' ফারসি ভাষা থেকে গৃহীত। 'বসরা' ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ নগরীর নাম। 'গুল' অর্থ গোলাপ ফুল। 'বসরা-গুলের' উল্লেখ নজরুলের সৌন্দর্যের ধারণায় যেমন ভিন্ন স্বর নিয়ে এসেছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও এটি নব-উপকরণ ও নব-সৌন্দর্যবোধের আধার হিসেবে বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। দুই. 'খুন' ফারসি, 'খারাবি' আরবি শব্দ। নজরুল তাঁর অধিকাংশ লেখায় 'রক্ত' অর্থে 'খুন'– শব্দ নির্বাচন করেন। বাংলা সাহিত্যে এটি প্রবল আলোড়ন ও বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। স্বয়ং কবিগুরুও এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। স্পষ্টভাষায় নজরুল তখন জানান : 'যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর এই নতুন শব্দ-ভীতি দেখে বিস্মিত হই। মনে হয়, তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক কেহ এবং অনেক কিছু আছে।... নৈলে আরবি-ফারসি শব্দের মোহ ত আমার আজকের নয় এবং কবিগুরুর সাথে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই এতদিন ত কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে!' (নূরুল ও রশিদুন, ২০১১ : ১৯৬) তাই বলে নজরুল যত্রতত্র 'খুন' শব্দ চাপিয়ে দেননি। উদ্ধৃতির তিন সংখ্যক যৌগিক শব্দেই তিনি রক্ত শব্দ ব্যবহার করেন। এখানে 'রক্ত' ও 'মঞ্জরী' শব্দদ্বয় সংস্কৃত হলেও 'গোলাপ' শব্দটি নিলেন ফারসি ভাষা থেকে। রাজনীতির আলোড়নে রক্তই পরিণামী ত্যাগের ও সাম্য-সম্ভাবনার ইঙ্গিত বয়ে আনে। নজরুল তাই বারংবার রক্তের ইমেজ গড়ে তোলেন কবিতার শরীরে। কখনো বিপ্লবের, কখনো পবিত্রতার, কখনো ইঙ্গিত বহন করে রক্তের ইমেজ–

দু'ধারী ধার শেরে-খোদার, রক্তে-পূত-বদন।
খুনে আজকে রুধবো মন। ...
আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ-সম মোল্লা খুন-বদন!
[কোরবানী]

হযরত ইব্রাহিমের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ উন্মোচনে কবির সহায় ইসলামি অনুষঙ্গী শব্দের যৌগিকীকরণ। উদ্ধৃতিতে যৌগিকীকরণের দুটি দৃষ্টান্ত রয়েছে : এক. শেরে-খোদা' শব্দের যৌগিকীকরণ ঘটেছে যথাক্রমে ফারসি শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে। দুই. 'খুন-বদন' এর উৎসস্থল যথাক্রমে ফারসি ও সংস্কৃত। নজরুল উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিত সমাজপটে দাঁড়িয়ে সেমেটীয় ধর্মাদর্শের সত্য-ন্যায় ও ত্যাগের মহামহিম চেতনায় অনুপ্রাণিত। সেই চেতনা সঞ্চারিত করতে চান সমকালীন জনমানসে এমনকি সর্বকালের পাঠকের করোটিতেও। পাঠক হিসেবে তাই এ কবিতা পাঠান্তে আমরা অনুপ্রাণিতও বটে। বর্তমান সময়ের ক্লেদ-নির্বেদ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় এবং মুখ থুবড়ে-পরা মানবতাকে বাঁচিয়ে তুলতে নজরুল-কথিত অন্যায়-অসত্যের জন্যে অন্তরের পশুত্বের বলিদান জরুরি হয়ে পড়েছে। একটি যুগের ঘটনা কবি প্রাসঙ্গিক করে তোলেন আবহমান কালের জন্যে। কবির একান্ত আরাধ্য তাই রক্ত-বিপ্লবী 'খুন-বদন'; সত্য ও পবিত্রতার ঝিলিক আছে যে মুখশ্রীতে। রক্ত-বিপ্লবের পথ বেয়ে অর্জিত হয় পবিত্রতা, মুছে যায় অপশাসনের গ্লানি। আসলে সমাজ-রাজনৈতিক বিপ্লবের পাশাপাশি নজরুলকে আরেকটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে। সে-বিপ্লব ভাষা-বিপ্লব। এ বিপ্লবে তিনি নিঃসঙ্গ হলেও অসংকোচ ও দ্বিধাহীন নিঃসন্দেহে। অবলীলায় তাই দেশীয়-অদেশীয় শব্দের সংশ্লেষে যৌগিকীকরণের ডালি সাজিয়ে তোলেন নজরুল। –

ভাই-বেরাদার পালাও এখন! দূর রহো! দূর রহো!
হুর্‌রো হো! হুররো হো!
[কামাল পাশা]

ইংরেজি 'brother'-এর বাংলা প্রতিশব্দ ভাই। ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতিনিধিত্বশীল অংশ হিসেবে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ 'ভাই-বেরাদার'। ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ বাংলা কবিতায় নতুন কোনো চমক নয়। তবে এখানকার অভিনবত্ব যথোপযুক্ত ও মানানসই শব্দ বাছাই ও তার যথাসম্ভব প্রয়োগ-সাফল্যে। ইংরেজের অপশাসনের বিরুদ্ধাচরণে অকুণ্ঠচিত্তে তিনি তাই বেছে নেন ইংরেজি শব্দ। লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার হলো: বাক্যটিতে শুধু 'ভাই' শব্দ ব্যবহারে যেখানে অর্থকাঠামো অক্ষুণ্ন থাকছে, সেখানে নজরুল যুক্ত করেন 'বেরাদার' শব্দটি। এমনটি তিনি কেন করলেন, কিংবা এটি কি তাঁর কোনো শিল্পত্রুটি, নাকি তাঁর সচেতন শিল্পপ্রয়োগ? এসব প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের নজরুলের যাপিত জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দরিদ্র-পরিবেশজাত হয়েও

পরিশীলিত সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকার নজরুলের 'Oral Tradition' (বিশেষত লেটো গানের অভিজ্ঞতা)- এর সঙ্গে ছিল নাড়ীর ও আত্মার টান। বাল্যবেলা থেকেই কোনো কিছু দ্রুত রচনা করার প্রবণতা, জনচিত্ত আকর্ষক শব্দ, চলিত শব্দের অবিরল ব্যবহার, অবলীলায় একটির পর একটি শব্দ গেঁথে চলা প্রভৃতিতে ক্রমশ পারদর্শী হয়ে উঠছিলেন নজরুল; ভেতরে ভেতরে প্রস্ফুটিত হচ্ছিল তাঁর কবি-সত্তার সুপ্ত বীজমন্ত্র। হয়ত একজাতের শব্দের পুনরাবৃত্তি ভাষাকে প্রদান করে বহুমাত্রিক অর্থ-সামর্থ্য – এ বোধও ক্রম-উৎসারিত হচ্ছিল নজরুল-চিত্তে। এরই একটি প্রতিফলন ঘটেছে ওপরের শব্দবন্ধে। তিনি যা বলতে চান, যে চেতনার জাগরণ ঘটাতে চান; শুধু 'ভাই' শব্দটি সেই চেতনার ওজস্বিতা বহন করতে ব্যর্থ। কেননা নজরুল ভ্রাতৃত্ববোধের আরও সুদৃঢ় একটি বিশ্বজনীন পরিসর গড়তে আগ্রহী। 'ভাই' এর সঙ্গে ইংরেজি 'বেরাদার' যুক্ত হওয়ায় অর্থব্যঞ্জনা বেড়ে গেল বহুগুণে। কবি আহ্বান জানালেন বহুজনাকে, বহুস্বরকে। কবির একক স্বরের অন্তরালে এভাবেই প্রতিধ্বনিত হয় বহুর স্বর। এই সমগ্রতা নিয়েই পুরো কাব্যে কবি অভিযাত্রা করেন মহাকালের, মহামানবের সঙ্গে। কবির অভিযাত্রার বাহন তাই–

তাজি বোর্‌রাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত- হ্রেষা হেঁকে চলে!
[বিদ্রোহী]

মিথ-পুরাণ মহাকালের চিরসঙ্গী। নজরুলও তা-ই। তিনি তাই অস্বীকার করতে পারেন না পুরাণের আবেদন। ব্যক্তিচিত্তে জাগ্রত দ্রোহচেতনা মহাকালের পটে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন 'বোর্‌রাক' ও 'উচ্চৈঃশ্রবা' গতিময়তাকে কাজে লাগিয়ে। 'বোর্‌রাক' কোরানে উল্লেখিত দিব্য অশ্ববিশেষ। শ্বেতবর্ণের সুগঠিত ও সুশ্রী এ অশ্বের মুখাবয়ব নারীর ন্যায়। সুদীর্ঘ কেশ আর মুকুট (প্রচলিত নাম তাজ) পরিহিত। তাই এর নাম তাজি বোর্‌রাক। আর উচ্চৈঃশ্রবা হিন্দু পুরাণে বর্ণিত অশ্ববিশেষ। এদের গতিপথ উন্মোচিত হলো আরবি ও সংস্কৃত ভাষাজাত শব্দ যথাক্রমে 'হিম্মত' ও 'হ্রেষা'-য় বস্তুত তিনি চেতনভূমিতে যুগপৎ অনুভব করেন মিথকথার অন্তর্নিহিত সামর্থ্যকে, যা তিনি অনবরত ছড়িয়ে দেন কবিতার শরীরে। এটি কবিতায় ভিন্ন মাত্রাও এনে দেয় – 'The poet of today –and by that I mean the poetic impetus in all of us today – is profoundly inhabited by the dearth of shared consciousness of myth. (William & Max, 1976 : 266) ফলে কবি আর একক থাকেন না, তাঁরএকক অভিযাত্রার সঙ্গী হয় সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বসংস্কৃতির মানবপ্রবাহ–

নিয়ে তৃষা সাহারার দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার!
[মোহর্‌রম]

আরবি ও সংস্কৃত শব্দের যৌগিকীকরণে সৃষ্ট 'কারবালা-প্রান্তর' মুসলিম অনুষঙ্গজাত শব্দ হলেও এতে সঞ্চারিত সর্বধর্মীয়, সর্বমানবীয় আবেদন। পরাধীনতার বন্ধনমোচনের সংগ্রামে আরেকটি 'কারবালা-প্রান্তর' অনিবার্য, যেখানে এজিদের পঞ্জা চুরমার করে দিয়েছিল মুসলিমের ঐক্যের শক্তি। 'কারবালা-প্রান্তর' শব্দবন্ধের মধ্যেই সংগুপ্ত রয়েছে সংশ্লিষ্ট কবিতায় বিধৃত মৌল প্রবণতা। যুগে যুগে জন্ম-নেয়া এজিদদের ধ্বংস, মৃত্যু-শোক, হাহাকার-বেদনা, ত্যাগ-তিতিক্ষার ধারা বেয়েই অনাগত মানব সন্তানের জন্যে আসবে স্বর্ণালি সকাল। কবির আহবান:

আনোয়ার! মুশকিল
জাগা কঞ্জুশ-দিল,
[আনোয়ার]

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল্-সাফ্!
[খেয়া-পারের তরণী]

তাই ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে কবি খুঁজে চলেন আনোয়ারের মতন বীর্যবত্তা বীরসেনানিদের। তাঁরা অন্ধকূপসম সময়ের বুকে আলো জ্বালবার প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হবেন। অন্যদিকে কবি নতুন প্রাণের উন্মাদনা সৃষ্টিতে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয়দের ধিক্কার জানান তীব্র, তীক্ষ্ণ ও জ্বালাময়ী ভাষায় : আখ্যা দেন 'কঞ্জুশ-দিল'ধারী বলে। এখানে কবির আশ্রয় সংস্কৃত 'কঞ্জুশ' ও ফারসি 'দিল' শব্দ। শ্বাসাঘাতের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও শব্দগুলো শ্রুতিসুখকর হওয়ায় এখানে কাব্যগত স্বতঃস্ফূর্তি অক্ষুণ্ন থেকেছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে কবি 'দিল' ফারসি এবং 'সাফ' আরবি ভাষাজাত শব্দের সমন্বয়ে তৈরি করলেন 'দিল্-সাফ্' শব্দটি। ভিন্নভাষী শব্দসমূহকে বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদের মর্যাদায় এভাবেই অভিষিক্ত করেন নজরুল। আর শব্দগুলোও মিটিয়েছে মহাকালিক আবেদন।

ছয়

সমাসবদ্ধ শব্দ : যৌগিকীকরণ ও বহুস্বরিক বোধ

শব্দের একটি চলমান আকর নিয়ে নজরুল হাজির হন *অগ্নি-বীণা* কাব্যে। তাতে শব্দের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। প্রয়োগসাফল্যে সেগুলোর অর্থান্তর ঘটে, বহু অর্থের সম্ভাবনা গড়ে তোলে। প্রচলিত-অপ্রচলিত, প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক, দরকারি-অদরকারি সবধরনের শব্দ নিয়ে খেলা করেন অন্তরস্থিত বিদ্রোহানুভূতির রূপায়ণে। একাব্যের শব্দ ব্যবহারে একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সমাসবদ্ধ শব্দের যৌগিকীকরণ। ভারতমাতার বুকে পরাধীনতার কালো ছায়া কবিকে দগ্ধ করে, করে বিপ্লবী। কবি তাই বলেন–

নাচে পাপ-সিন্ধু তুঙ্গ তরঙ্গ।
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে!
[খেয়া-পারের তরণী]

ঔপনিবেশিক শোষণের চিত্রায়নে নজরুল ব্যবহার করেন 'পাপ-সিন্ধু', 'মহানিশা' সমাসবদ্ধ শব্দদ্বয়। অন্যায়-অসত্য-অসুন্দরের খেলায় মাতোয়ারা হয়ে অপশক্তি ভারতবর্ষের সুন্দর মুখশ্রীই পাল্টে দিয়েছিল। পরাধীন ভারত নজরুলের নিকট প্রতিভাত হয়েছিল পাপ-রূপী সিন্ধু হিসেবে। কিন্তু নজরুল কেবল পরাধীনতার গ্লানি বয়ে বেড়াবার পাত্র নন। আর তাই সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ায়, প্রাণের গতিশীলতায় এবং অনিয়ন্ত্রিত যৌবনবেগে কবি দীপ্ত ঘোষণা দেন:

এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে ঊষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে!
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
[প্রলয়োল্লাস]

ধমনিতে টগবগিয়ে ওঠা রক্তের মাতাল উন্মাদনায় উন্মাদ কবি উপনিবেশের বিপক্ষে সত্যসন্ধ ছিলেন। নজরুল শতকণ্ঠের জাগরণে তাই শোনান শৃঙ্খল ভাঙার গান : 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর্'। নৈরাশ্যপীড়িত সমাজে যৌবনদৃপ্ত, অনুসরণীয় ও সাহসী ব্যক্তিত্ব না পেয়ে দ্রোহচেতনার অনিবার্য উৎস হিসেবে নজরুল অবগাহন করেন ভারতীয় পুরাণ, বাংলার লোকজ পুরাণ, ইউরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যীয় মিথ এবং ইসলামি ঐতিহ্যের নানা প্রান্তে। সেখানে কবি খুঁজে পান আবেগে-অনুভবে-বিদ্রোহে ধ্বংস ও সৃষ্টির যুগল অনুষঙ্গ। ভাঙন ও সৃজনধর্মের প্রতিরূপক হিসেবে শিবের অমিত তেজ ও শক্তিমত্তার বন্দনায় নজরুল সদা অস্থির ও চঞ্চল। এখানে 'মহা-নিশা'-রূপী পুরাতনীকে নিঃশেষিত করে 'শিশু চাঁদে'র স্বপ্নে বিভোর কবি। শুক্লপক্ষের প্রথম দিককার ক্ষীণ চাঁদ শিশু চাঁদ। নতুন সৃষ্টির সংরাগ-শক্তিকে তিনি তুলে আনেন শিশুচাঁদের প্রতীকে। আর তাই নবজীবন ও সমাজের ডাকে সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা ও আনন্দ বিশ্লেষণ করেন 'জয়ধ্বনি' (জয়সূচক ধ্বনি) ও 'প্রলয়োল্লাস' (প্রলয়ের জন্য যে উল্লাস) শব্দে। জয়ের নেশায় প্রবল উন্মত্ত কবির উচ্চারণ :

আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!

[বিদ্রোহী]

অন্যায়-অপমানের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা উচ্চকণ্ঠ নিয়েই নজরুল হন 'স্রষ্টা-সূদন' এবং 'ভগবান-বুক' বিদীর্ণকারী। নজরুলের অন্তর্দেশে বাহিত দ্রোহ চেতনা ক্ষুদ্র আমি-কে কেন্দ্র করে ক্রম-উন্মোচিত হলেও শেষমেষ তা ব্যক্তিক গণ্ডি অতিক্রম করে যায়। অনেকটা এলোপাথাড়ি ঢঙে টুকরো টুকরো ব্যক্তিক দ্রোহচেতনার যে বিন্যাস পুরো কবিতাটিতে তৈরি হলো, তা ক্ষুদ্র আমি-র বিন্যাস নয়; কারণ ব্যক্তি-বিদ্রোহ ও প্রেমে অবিরাম সংযুক্ত হতে থাকে দেশ-কাল-সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস। তখন কবির কথা সমগ্র মানবের জন্যে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে; গড়ে ওঠে 'আমরা'-র পলিফনি। আবার কবির চেতনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে পাঠকের। কবির 'আমি'-র সঙ্গে সংযোগ ঘটে পাঠকের 'আমি'-র। ফলে তৈরি বহুস্তরায়িত অর্থ-কাঠামো এবং তা নিয়ত পরিবর্তনশীল, রূপান্তরকামী। আসলে কবির মধ্যেই চলতে থাকে 'আমি' ও 'আমরা'-র পলিফনি। কারণ কবি নিজের কথায় বুনে চলেন আবহমান মানবপ্রবাহের মনের বাসনা-গাথা। ঔপনিবেশিক সমাজের গ্লানি ও যন্ত্রণা নজরুলকে অশান্ত, চঞ্চল ও প্রতিবাদী করে তোলে। কিন্তু সমাজে তিনি খুঁজে পাননি কোনো প্রতিবাদী সত্তা। তাই নিজের বিদ্রোহী ভাব তুলে ধরে সামষ্টিক বিপ্লবের সম্ভাবনা তৈরি করে দেন লোকসমাজে। কবির ব্যক্তিক অনুভূতি-সঞ্জাত এ কবিতা বেশ কাঁপিয়েছিল সে-সময়কে। সুতরাং বলা যায়, পুরো কবিতায় আমি রয়েছে প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে আমরা-র পলিফনি। অন্যদিকে অলৌকিক শক্তি, বিমূর্তচেতনা এসবের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নজরুল বলেন লৌকিকতার, মূর্ততার কথা। প্রত্যক্ষতায়, যুক্তিশীল অনুমানে এবং আত্ম-অনুভাবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি কবিতায় শোনান নব-জীবনপ্রত্যয়ী কথামালা; যা আমূল পাল্টে দেয় প্রথাপালিত পৃথিবীকে। নজরুলের ভগবানকে তখন আর ধর্মীয় দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। অত্যাচারী ইংরেজ শক্তি তাঁর চোখে তাই ধরা দেয় ভগবানরূপে। কালের প্রেক্ষাপটে এই ভগবান আবার প্রমূর্ত হন নানা রূপে। শেষপর্যন্ত এ ভগবান সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শোষকের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়। অর্থের স্থিরতাপ্রাপ্ত শব্দকেও তিনি অস্থির করে তোলেন–

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!

[বিদ্রোহী]

নজরুলের ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। রূপসাধক কবির চেতনায় এই ঈশ্বরই বহুরূপে ধরা দেয়: আল্লাহ, খোদা, ভগবান, বিধাতা, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, শিব, যিশু আরও কত

কি! এই ঈশ্বরের প্রতি কবির অনুভবের মাত্রাও বিচিত্র; প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ক্রোধ, ক্ষোভ এবং শেষাবধি বিদ্রোহী রূপে। কখনো নিজেকে ঈশ্বরতুল্য ভেবেছেন। রাজটীকা (রাজার ললাটে যে তিলক/ টীকা পরানো হয়) তাই তাঁর ললাটে শোভা পায়। এটি সম্মান ও ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে পরানো হয়। নজরুল নিজেই সে-তিলক ললাটে ধারণে আগ্রহী। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নজরুল সাম্যবাদী জীবনবোধে প্রবলভাবে আলোড়িত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন সর্বহারা শ্রেণি একদিন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে, প্রতিষ্ঠিত হবে বৈষম্যমুক্ত সাম্যময় সমাজ। নজরুল এ সর্বহারা শ্রেণির প্রতিভূ। ব্যক্তি নজরুল সমগ্র বঞ্চিতের প্রতিনিধি হয়ে ধারণ করেন এই তিলক। এক্ষেত্রে তিনি রোম্যান্টিক ভাবাবেগে তাড়িত। রবীন্দ্রনাথের যেমন "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ", নজরুলের তেমনি "বিদ্রোহী" : আবেগের প্রবহমান স্রোতে ভেসেছেন, হয়তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, কিংবা চাননি। বিদ্রোহী মনোভাবী এ কবি সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত : "কোনো মানস মায়া নয়– তাঁর তারুণ্য মর্মছেঁড়া বাসনাবিদ্ধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত স্বাধীন গতিবেগ – 'বল বীর, চির উন্নত মম শির' – এ গান আমি শিক্ষার অনুভূতি থেকেই পেয়েছি।' – নিজেই বলেন তিনি, 'নিজের স্বাধীনতাকে কখনো বিসর্জন দেইনি।' এই যে আত্মস্বাধীনতা এটি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বভাবজাত এবং একান্তই পার্থিব অস্তিত্বের অভিমুখী।" (বেগম, ২০১৩ : ৩৮) কবিতাটি 'আমি' এবং 'আমিত্ব' নির্দেশক সর্বনামে ভরপুর। এ তাঁর আত্মসত্তার প্রতিষ্ঠার প্রচ- ও প্রবল প্রয়াস। নজরুলের 'আমি' এমন এক প্রাণময় ও তেজোপূর্ণ সত্তার নাম, যে নিজেকে বিশ্বসংসারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে এক ধরনের অহমিকাবোধসঞ্জাত আনন্দ উদ্‌যাপন করে। এই অহমিকামিশ্রিত আনন্দ বিশ্বব্যাপী শোষণের বিপক্ষে। পরক্ষণেই বোঝা যায় কবিতাটির সমস্ত আয়োজন সমগ্রতাকে ঘিরে। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতার আয়োজন প্রকৃত অর্থে সমগ্রতার স্বর নির্মাণেরই।–

রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।
[রক্তাম্বরধারিণী মা]

'রক্তাম্বরধারিণী মা' বলে কবি পুরাণের দেবী দুর্গার শরণ নিচ্ছেন। দেবীর শিবনাশিনী প্রচ- রূপের মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয় কল্যাণময় অশিবনাশিনী কল্যাণকামী রূপ: কবি কামনা করেন এ দ্বিবিধ দিকই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এর আবেদন আরও ব্যাপক। 'রক্তাম্বরধারিণী' একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। 'রক্তাম্বরধারিণী' বলতে রক্ত রঙের (লাল রং) অম্বর পরিহিতা নারীকে বোঝায়। 'অম্বর' শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ: ক. আকাশ, খ. শাড়ি। ঔপনিবেশিক শোষণে ভারতবর্ষের আকাশ রক্তাক্ত, রক্তাভ ভারতমাতার আঁচল, এমনকি বিশ্বমাতারও। বিশ্বের বুকে ঘটে যাওয়া সব রক্তাক্ত ইতিহাসের ধারা

বেয়েই নেমে এসেছে শান্তির, মুক্তির সুমহান পথ। সে-পথও অগ্নিপথ। এ কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতায় ভাবের অনিবার্য টানে বারংবার এসেছে আগুনের প্রসঙ্গ। তাঁর অগ্নিপ্রীতির দৃষ্টান্ত রয়েছে কাব্যের শুরুতেই –

অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে;
তাই ত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে।

[উৎসর্গ, *অগ্নি-বীণা*]

'অগ্নি-যুগের' (অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি দলের ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় 'অগ্নি-যুগ' বলে পরিচিত) সংগ্রাম ও সংগ্রামী ব্যক্তিবর্গের প্রতি নজরুলের ছিল অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) তাঁদের একজন। ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের ধ্বজা নিয়ে তাঁর দীপ্ত পদার্পণ। বারীন্দ্রকুমার, যিনি তেজের আধার, তিনিই আবার প্রেমময় বৈষ্ণব : এ তো নজরুলের জীবন প্রক্রিয়ারই অন্যরূপ। উভয়ের পথ এক : অগ্নি-পথ। বারীন্দ্রকুমার যেমন নজরুলের চেতনায় অগ্নি-ঋষি, আমাদের চেতনায় তেমনই এক অগ্নি-পুরুষ নজরুল। 'বৈদিক অগ্নি-ঋষির স্মৃতি ও চৈতন্য কোমলে-কঠিনে রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন কবি। মূলত ধ্বংস ও লালন-পালনের দ্বান্দ্বিক চিত্রময়তা যা নজরুলের স্বভাবত মৌলিক প্রবণতা তারই ঐতিহ্যিক যোগসূত্র নির্মিত হয়েছে এখানে।' (সন্‌জীদা, ২০১৩ : ১৬৬) উত্তরকালে নজরুল-সৃষ্ট এ অগ্নি-পথে হেঁটেছেন অনেকেই। উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন শওকত ওসমানও। এর একটি বড়ো দৃষ্টান্ত *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) উপন্যাস। আয়ুব সরকারের শ্বাসরুদ্ধকর সময়ে এক কঠিন ভাষা-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। সময়ের পটে প্রত্যেক দ্রোহী সাহিত্যিককে এই অগ্নি-পথের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যুগে যুগে সাহিত্যিকেরা তাই অগ্নিঋষি। আর তাঁদের প্রতীকও তাই 'অগ্নি-বীণা' : অগ্নির মতো উত্তেজক সুর ঝরায় যে বীণা। 'অগ্নি' ও 'বীণা' বস্তুগতভাবে বৈপরীত্যসূচক। নজরুল-মানসের একদিকে প্রেম, অপরদিকে দ্রোহ। একটি প্রান্ত অপর প্রান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সম্পূরক। অগ্নি নজরুলের অত্যন্ত প্রিয় প্রসঙ্গ। অগ্নির জ্বলন ক্ষমতা প্রকাশমান, গড়নের ক্ষমতা সংগোপন। তাই কবির জীবন সাধনা আজ অগ্নিময়, রুদ্রময়, প্রলয়ময়। অন্যদিকে বীণা কবির রোম্যান্টিক ভাবাবেগের প্রতীক। বিপরীত দুটি চেতনার সংশ্লেষ ঘটাতেই নজরুল এমনটি করেন। ফলে যে 'অগ্নি' কবির দ্রোহীভাবের অনুষঙ্গী, তাতেই প্রকাশিত তাঁর রোম্যান্টিক প্রেম-উচ্ছ্বাসের। তাই বহ্নিশিখা জ্বেলে নজরুল একই সঙ্গে দ্রোহ আর প্রেমের কথা বলেন –

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
[বিদ্রোহী]

এসেছে রে সাথে উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী কমলা ঐ,

সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা
এলো বীণা-পাণি অমলা ঐ।
[আগমনী]

ষোড়শী তরুণীর হৃদ-মাঝারে জাগ্রত প্রেমের রূপকল্প নির্মিতিতে এখানে কবি প্রাসঙ্গিক করে তোলেন অগ্নি প্রসঙ্গ। নবপ্রেমে উদ্দাম কুমারীর নয়নে কবি দেখেন বহ্নিরাগ। আবার পুরাণ-প্রতিমাকে মানবিক করে তোলেন 'উৎপলাক্ষী' উপমা দিয়ে। উৎপলের তথা পদ্মের মতো সুন্দর চোখের রমণীর আছে কেবল প্রেম। আসলে 'কবিতায় শব্দের ক্ষমতা হল আগ্নেয়গিরির লাভার মতো, মূলে উলটপালট না হলে কাঠামোটিই দাঁড়ায় না। অগ্নি থাকে মূলে, বস্তু বা বসুন্ধরাতে বিগলিত করে তৈরি হয় লাভা এবং গিরি।' (সিরাজ, ২০১৫ : ১৩) কখনো ঋষি, কখনো বীণা, কখনোবা প্রিয়ের নয়ন।আসলে প্রেমে-বিদ্রোহে, ভীষণতায়-মধুরতায়, নাশকতায়-নবসৃষ্টিতে, কঠোরে-কোমলে, আঘাতে-সহযোগিতায় নজরুল এমন সব বিপরীত-প্রবণতার জন্ম দেন। ফলে দ্যোতকগুলো অস্থির ও চল-চঞ্চল হয়ে ওঠে। সময়ের অস্থির দশাকে শব্দের মধ্যে এভাবেই সন্নিবেশিত করে নেন তিনি। ফলে তাঁর বিনির্মিত কোনো ইমেজই একক অর্থে স্থির থাকে না; তা পাল্টে যায়, অবিরাম নির্মাণ করে চলে ভিন্ন স্বর –

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।
[বিদ্রোহী]

এখানে যে বিশাল আমিত্ব নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ ও অহমিকাবোধ করেন, তাতে দ্রোহ ও প্রেম, কোমল ও ভয়ংকরের সংশ্লেষ অভূতপূর্ব। শোষণ বঞ্চনা ও অধীনতার গ্লানি বয়ে বেড়ানোর যন্ত্রণায় কাতর কবিহৃদয়ের একান্ত অনুভবঃ রাজবেশ ম্লান গৈরিক; নজরুলের এ উচ্চারণে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বুদ্ধমূর্তি কিংবা বৌদ্ধ ধর্ম-ইতিহাসের সংকেত-প্রতিমা। "তবু শিরোনামায় যুক্ত আত্মঘোষণার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্য ও বেদনার সংবেদ সত্ত্বেও, সমগ্র "বিদ্রোহী" কবিতায় ওই ঘোষণার মতো প্রাতিস্বিক, অনন্য এবং সুনির্দিষ্ট করে বললে অদ্বিতীয় আত্মবিবৃতি সম্ভবত আর নেই।" (ভীষ্মদেব, ২০০৬ : ৭৮) কেননা নজরুল জানেন বিশ্বের বুকে একটি সমৃদ্ধতম স্থান হিসেবে ভারতবর্ষের অবস্থান। কিন্তু হাজার বছর বিদেশি শক্তির শোষণ, আক্রমণ ও লুণ্ঠনে বাংলা আজ হতশ্রী, রিক্ত। বাংলার রাজবেশ তাই ধূলিমলিন, ধূসর। এ যন্ত্রণা তাঁর কবি সত্তার মূল প্রেরণা। কেননা নজরুলের 'আমি' হুইটম্যানের (The song of Myself) 'আমি'র মতন কেবল উপলব্ধির জগতে বাস করে না। তাঁর 'আমি'-র নিকট সবই মূর্ত ও স্পষ্ট। এ 'আমি' ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রকাঠামো অতিক্রম করে উপনীত হয় বিশ্বপটে; সৌরমণ্ডলের উদ্দাম-উদাত্ত পথের

আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমস্তকিছুকে উপেক্ষা করে ছুটে চলে অবিরত। সেই 'আমি'-ই তো বলতে পারে:

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃমহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
[ধূমকেতু]

ধূমকেতু গতিময় অস্তিত্বহীনতার চিহ্ন। প্রচণ্ড গতিতে এর প্রকাশ; আবার দ্রুত অস্তিত্বহীনও হয়ে পড়ে। নজরুল ধূমকেতুর গতিশীলতাকে নিয়েছেন, ক্ষণস্থায়িত্বকে নয়। নজরুলের 'ধূমকেতু' তাই অবাধ্য ও বিদ্রোহী: প্রচণ্ড তার বেগ, অসীম তার ক্ষমতা। তা বৈপ্লবিক সম্ভাবনামণ্ডিত এবং মঙ্গলময়। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপড়ে ফেলে নজরুল তাই ধূমকেতুর অগ্নিময় পথে আবির্ভূত হন। তাঁর আবির্ভাব মহাকালের, মহামানবের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গড়ে তোলে বহুস্তরিক প্যাটার্ন। তাই ভাঙা-গড়া, প্রেম-যুদ্ধ, ধ্বংস-সৃষ্টি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো অমোঘ ও পূর্বনির্ধারিত ঘটনাচক্রের অংশ হয় নজরুল পাঠক।

সাত

শব্দের যৌগিকীকরণের নান্দনিক দিক

সচেতন শব্দশিল্পী হিসেবে নজরুল প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন কবিতাকে। তৎসম-তদ্ভব,আরবি-ফারসি, উর্দু-হিন্দি-সংস্কৃত, বিদেশি, গ্রামীণ, লোকজ অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে নজরুল যেকোনো উৎস থেকে অবলীলায় বেছে নেন ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দ। অধিকাংশ যৌগিক শব্দ তিনি হাইফেন দিয়ে লেখেন। যেখানে প্রয়োজনীয়তা নেই সেখানেও শব্দটি লিখেছেন হাইফেন দিয়ে। নজরুল কেন এটি করছেন? তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন নবীন এক সমাজ গঠনের। নজরুল ভারতবাসীর নবজাগরণ চেয়েছিলেন। এই নবজাগরণ মানে নতুন করে নতুন ভাবে নতুন রূপে জেগে ওঠা এবং জাগানো। সমাজে নতুন করে বাঁচার জন্যে, নতুন শ্রেণিবিন্যাসের জন্যে নতুন শিল্পপ্রকরণ অনিবার্য ছিল। সে-পথ উন্মুক্ত করে দেন তিনিই। শব্দগঠনের এই ভিন্ন রূপায়ণের পথে তিনি হেঁটেছেন মূলত নব্যসমাজসত্তার উদ্ভাসনের জন্যেই। তাছাড়া এ কাব্যে হাইফেনেশন আসলে সেতুবন্ধন। তিনি একটা সেতুর সিম্বল তৈরিতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে কবির আশ্রয় সাধারণ সমাসবদ্ধ শব্দ নয়, বিশেষায়িত সমাসবদ্ধ শব্দ। সমাসবদ্ধ শব্দ তিনি বিশেষায়িত করেন হাইফেন দিয়ে। তাঁর নিকট সংযোগটাই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চান বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্বমানবের সঙ্গে সংযুক্ত হতে। হাইফেন সেই সংযোগেরই ইঙ্গিতবহ। প্রকৃতই– "অগ্নি-বীণা কাব্যে নজরুলের শব্দচেতনায় এখানেই স্বাতন্ত্র্য যে, তিনি ধ্বনিপ্রবাহের অনুগামী করে শব্দের মধ্যে নিয়ে এসেছেন প্রবল জীবনাবেগ। শব্দব্যবহারের এই নতুন পরীক্ষা আধুনিক বাংলা

কবিতার বিকাশকে সদর্থকমাত্রায় করেছে প্রভাবিত।"(বিশ্বজিৎ, ২০০৫ : ২১) নজরুলের ব্যক্তিচিত্তের স্বাধীন-প্রিয় মানসতাও তাঁর শব্দ-যাত্রার অংশীভূত হয়েছে নিজগুণেই। শব্দচর্চায় তিনি যে স্বাধীনতা আনয়ন করেন তা কাব্যভাষাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর। সুতরাং বলা যায় কবিতা হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনানুভূতির নান্দনিক প্রকাশ।

আট

উপসংহার

কবির কাজ হলো শব্দ নির্বাচন, শব্দের অন্তর্গত ধ্বনিসুষমা আবিষ্কার এবং এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে সেই শব্দটি পার্শ্ববর্তী শব্দের সঙ্গে অন্বিত হয়ে সৃজন করে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। তখন প্রয়োগকৃত শব্দটি বহু-অর্থমাত্রাকে ধারণ করবার সামর্থ্য লাভ করে। একটি টেকস্টের প্রেক্ষাপটে শব্দ নিছক বক্তেব্যের ধারক নয়, তা আরও গভীর দ্যোতনাবাহী হয়ে ওঠে। শব্দের যৌগিকীকরণে নজরুল এসব মান্য করেন খুব জোর এবং আন্তরিকতার সঙ্গেই। শব্দের যৌগিকীকরণের মাধ্যমে তিনি কবিতার ভাষায় তৈরি করেন এমন এক সম্মোহনী সামর্থ্য যা পাঠককে বিমোহিত, সচকিত করে এবং পাঠক-চিত্তে জন্ম দেয় ভিন্ন রস-সংবেদনার। স্বকাল ও স্বসমাজের বহির্বাস্তবতাকে ধারণ করেও স্বোপার্জিত শিল্পবিশ্বাসের আলোকে ভিন্ন এক বাস্তবতার রূপকার হন কবি। সে-বাস্তবতা নির্মাণে কবির সঙ্গী যৌগিকীকরণ এবং তা জীবনের ইতিবাচক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এর মধ্য দিয়েই কবি বহুকালের তৃষিত পৃথিবীতে শোনালেন শান্তি-সাম্য, অভেদ-আনন্দ ও দ্রোহ-প্রেমের বাণী। আসলে যৌগিকীকরণ কীভাবে গঠন করে কবিতার শিল্পরূপ ও অর্থবৈভব তারই একটি প্রক্রম হিসেবে পাঠ করা যায় এ কাব্যটিকে। বলা যায় সংগ্রাম আর সংক্ষোভের এক শব্দ-আয়ুধ হিসেবে হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাসে *অগ্নি-বীণা* নিঃসন্দেহে এক নতুন নির্মাণ।

গ্রন্থপঞ্জি

অলোক রায় সম্পাদিত (৪র্থ মুদ্রণ ২০১০)। *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (মে ১৯৮৭)। *নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

কাজী নজরুল ইসলাম (৮ম মুদ্রণ, ২০১২)। *নজরুলের উপন্যাস : মৃত্যুক্ষুধা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০১)। *বঙ্কিম রচনাবলী : উপন্যাস সমগ্র*, তুলি কলম, কলিকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (এপ্রিল ২০০৫)। *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা

বেগম আকতার কামাল (অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩)। *কবির চেতনা চেতনার কথকতা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা

মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত (৩য় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৭/ জুন ২০১০)। *নজরুলের কবিতা সমগ্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুন্ নবী সম্পা. (ফেব্রুয়ারি ২০১১)। *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৩)। *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), প্রতীক, ঢাকা

সিরাজ সালেকীন (২০১৫), *নজরুল-টোটেম*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সৈকত আসগর (১৯৯৪), *গুরুসদয় দত্ত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

David Macey (2000), *The Penguin Dictionary of Critical Theory*, penguin books, England

Philip Wheelwright, `Poetry, myth and Reality', *Twentieth Century Criticism : The Major Statements,* (1976) Wlliam J. Handy & Max Westbrook (editor), New Delhi, India

Fabb, Nigel (1998), *Handbook of Morphology*, Blackwell, oxford

প্রবন্ধপঞ্জি

ভীষ্মদেব চৌধুরী (ফেব্রুয়ারি ২০০৬)। 'মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক', *উলুখাগড়া*, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা

সিরাজ সালেকীন (৩০ মে ২০১৩)। 'অগ্নি থেকে মঙ্গলপ্রদীপ', *বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর কাজী নজরুলের সৃষ্টিবীক্ষা*, সন্‌জীদা খাতুন সম্পাদিত, ছায়ানট, ঢাকা

সুশীলকুমার গুপ্ত (ফেব্রুয়ারি ২০০১)। 'নজরুল-যুগ', *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ* আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, এ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা